Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সালাহউদ্দীন আইয়ুব
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.8
Pages	149-167
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) আধুনিক বাংলা কবিতার মহৎ স্থপতিদের অন্যতম, এবং অনেকগুলো উপন্যাসের রচয়িতা। উপন্যাস আর কবিতা সাহিত্যের দুই আলাদা মাধ্যম, এবং কখনোই একটা অন্যটার বিকল্প নয়। জাক দেরিদা, মিশেল ফুকে, রোলাঁ বার্থ যে মুক্তপাঠবাদী সমালোচনাতত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন, এবং মিখাইল বাখতিন থেকে ফ্রেডরিক জেমসন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা যে নতুন উপন্যাসতত্ত্বের সমর্থক—তার আলোকে জীবনানন্দর উপন্যাসমালার পাঠ, বিচার ও বিতর্ক সম্ভবপর কিনা সেটাই বর্তমান প্রবন্ধের বিবেচ্য। জীবনানন্দের উপন্যাসমালাকে তাঁর জীবনী, ব্যক্তিগত ইমেজ ও কিংবদন্তী, এবং তাঁর মোহময় অপরূপ কবিতাভুবনের সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরীক্ষা করা হয়েছে।

রিসার্চ ফেলো, বাঙলা একাডেমি, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও উপন্যাস পরস্পরের পরিপূরক কিনা, সাম্প্রতিক অন্বেষণে এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন, কবিতার দিক থেকে উপন্যাস বিচার, কিংবা উপন্যাসের নিরিখে কবিতার মীমাংসা কতোটা সংগত ? 'কবিতা' এবং 'উপন্যাস' দুই আলাদা গোত্রের শিল্পকলা, তবু তার ভেতর বিনিময় কিংবা দুই গোত্রের যোগাযোগ কখনো কখনো বাঞ্ছিত, মনোজ্ঞ, এমনকি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাংলা সমালোচনায় এই দুই গোত্রের স্বাতন্ত্র্য-লুপ্তি, বিরোধভঞ্জন ও দূরত্ব-নাশ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বিচার, এবং *বনলতা সেন*-এর কিংবদন্তীর নিরিখে *মাল্যবানের* (১৯৪৮) উৎকর্ষ-নির্ণয় নতুন নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, কেন হয় এইরকম ? উপন্যাস ও কবিতার ভেদলুপ্তির কারণ কি ? এছাড়াও আরো একটা সমস্যা আছে, সেটা একান্তই বাংলা সমালোচনার সমস্যা। তা হলো, একই লেখক যখন যুগপৎ কবি এবং ঔপন্যাসিক, এবং যখন তিনি কবি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আর ঔপন্যাসিক হিসেবে গৌণ, তখন কবিত্বের খ্যাতিতে তাঁর উপন্যাসের মহিমাবিচার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও সেইরকম ঘটনা ঘটেছে।

জীবনানন্দ দাশ যেসময় সাহিত্যচর্চা করেছেন, তখন একদিকে ছিলো কল্লোলের আবহলোক, অন্যদিকে মার্কসবাদপুষ্ট ও যুদ্ধস্পৃষ্ট প্রতিবেশ। তবে দু-দিকের কোনোটিতেই জীবনানন্দকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করা যায় নি। বিপরীতে তিনি কাম্য মনে করেছেন মহানক্ষত্র-লোকের ইশারা ও আবশ্যক ইতিহাসজ্ঞান। 'ইতিহাস' এক অপরূপ প্রতীকের মতো জীবনানন্দকে অবিরাম টেনেছে। ওই ইশারা ও ওরকম জ্ঞান থেকে তিনি জীবন, জগৎ, সমাজ, সময় ও সভ্যতা বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ করেন মানবসভ্যতা ব্যক্তিভিত্তিক, ব্যক্তিই তৈরি করে সভ্যতার নিবিড় আশাকরোজ্জ্বল পটভূমি ও প্রেরণাব্যঞ্জিত ইতিহাস; সেজন্যে জীবনানন্দ বারবার প্রজ্ঞার কথা বলেছেন, প্রতিভা ও মনস্বিতার কথা বলেছেন, এবং এসবের স্ফুরণ সমীকৃত হতে দেখেছেন একাধারে গৌতম বুদ্ধের ব্যক্তিত্বে, মুহম্মদ-মার্কস-লেনিন-কনফুসিয়াসের চরিতবিভায়। ইতিহাসখনিতে জীবনানন্দ দেখেন দুঃখ আর দুঃখ আর দুঃখ কিন্তু তারই ভেতর আবার পেয়ে যান তিমিরহননের আয়ুধ, অমর শুশ্রূষা, সূর্যোদয়। এইভাবে তিনি সময় আর সভ্যতার পরিমাপ করেছেন, মানবজীবনের চরিতার্থতার সূত্র সন্ধান করেছেন, ভাবতে ভাবতে তিনি কোনো একটা জায়গায় পৌঁছুতে চেয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা, ইতিমধ্যেই, সমালোচকদের দৃষ্টিতে শুধু নয়— 'সময়' নামক বিচারকের মানদণ্ডেও অনশ্বর আসন অর্জন করে নিয়েছে। জীবনানন্দ দাশ যেরকম কবিতা লিখেছেন, এবং কবিতা নিয়ে তিনি যতোটা এবং যেরকম মত্ত ছিলেন, তা থেকে কারো মনেই হয়নি নির্জনে তিনি রাশি রাশি গল্প-

উপন্যাসেরও জনয়িতা। একটা জিনিস বোঝা যেতো, জীবনানন্দের পাঠাভ্যাস কেবল কবিতায় সীমাবদ্ধ নয়, মানববিদ্যার অন্যান্য অংশেও ব্যাপ্ত এবং রাজনীতি ও সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে বিচলিত না করে পারেনি। সেজন্যেই দেখা যায়, সমকালের অমোঘ প্রস্বর থেকে জীবনানন্দের স্নিগ্ধ কবিতাভুবনও মুক্ত নয়।

জীবননান্দের কবিতা নয়, তাঁর উপন্যাস আমাদের আলোচ্য। জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের প্রচণ্ড প্রভাবে তাঁর উপন্যাসের কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র-বিবরণ নিয়ন্ত্রিত। আত্মজৈবনিকতা খারাপ কিছু নয়, আত্মজৈবনিকতা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মহত্ত্ব কমে না; কিন্তু আত্মজীবনের প্রায় সমস্ত উপাদানের দ্বিধাহীন নির্বাচনহীন সরল ও স্বতস্ফূর্ত ব্যবহার জীবনানন্দের উপন্যাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একথা সত্য সময়ের চাপ ও প্রক্ষোভ জীবনানন্দকে উপন্যাস লেখার তাগিদ যোগায়, অন্যদিকে উপন্যাস-মাধ্যমের সমকালীন উপযোগও তিনি লক্ষ করেন। উপন্যাস লিখে নিজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে, এরকম হয়তো মনে হয়েছিলো তাঁর; সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে[১] সেই ইঙ্গিত পাই। *এ পোয়েট এপার্ট* নামে জীবননান্দ-গবেষক ক্লিনটন বুক সিলি জীবনানন্দের যে সাহিত্যিক-জীবনী লিখেছেন [SEELY 1990], তাতে জীবনানন্দের উপন্যাস-সম্পর্কিত এইসব তথ্য বিস্তৃতভাবে মুদ্রিত আছে।

জীবননান্দ দাশ সামাজিক জীবনে ব্যর্থ মানুষ। তিনি অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু তাঁর চাকরি নিরুদ্বিগ্ন ছিলনা। একাধিকবার তিনি চাকরিচ্যুত হয়েছেন। *স্বরাজ* (প্রথম প্রকাশ : ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৭) পত্রিকায় জীবনানন্দ চাকরি নেন কাগজটির প্রকাশলগ্নে, কিন্তু কাজ করেন প্রায় বেতনহীনভাবে এবং একপর্যায়ে ছেড়েও দেন। *স্বরাজে* জীবনানন্দ সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি 'রোববারের সাময়িকী' -অংশ দেখতেন ; একটা কলাম চালু করেন 'মন-মর্মর' নামে এবং সতীর্থ বন্ধুদের আমন্ত্রণ করেন এই কলামে লিখতে। চাকরির ছ'মাসের মাথায় *স্বরাজ* ছাড়েন জীবননান্দ এবং তখন থেকে তাঁর আর্থিক সংকট ঘনীভূত হয়। উপন্যাস লেখার ঝোঁক এভাবেই সৃষ্টি হয় তাঁর মধ্যে; যদিও এর আগেও, গল্প-উপন্যাস তিনি লিখেছেন ; তবে তা ছাপা হয়নি। *ময়ূখে* প্রকাশিত এক চিঠিতে জীবনানন্দ জানাচ্ছেন [জগদীন্দ্র মণ্ডল ১৩৬১], আমি বেশ কিছু গল্প এবং উপন্যাসের বই পড়েছি—দেশি এবং বিদেশি; এবং একসময় ঔপন্যাসিক হওয়ার অনুপ্রেরণা ছিলো আমার মধ্যে, সে আকাঙ্ক্ষা একেবারে মুছে যায়নি আজো।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে জীবনানন্দ জানিয়েছিলেন *পূর্বাশায়* ছাপবার জন্যে তিনি উপন্যাস পাঠাবেন অচিরেই, যদি সঞ্জয়বাবু আজ-কালের মধ্যে ব্যবস্থা করতে পারেন কয়েক'শ টাকার; সাগরময় ঘোষকেও বলেছিলেন 'উপন্যাস' লেখার কথা:

কিন্তু *পূর্বাশা* বা *দেশ* কোনো কাগজেই জীবনানন্দের কোনো উপন্যাস বের হয়নি। দুটো কারণে হয়তো : ক) কেউ তাঁকে আগাম টাকা দেয়নি; খ) তাঁর নিজেরই কোনো দ্বিধা ছিলো কথাসাহিত্য বিষয়ে। *প্রতিক্ষণ* থেকে জীবনানন্দের সবক'টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো পড়ে বোঝা যায়, সেই দ্বিধা অসংগত ছিলোনা।

জীবনানন্দ দাশ 'কবি' হিশেবে উত্থাপিত হন *কল্লোলে*, যদিও কল্লোলের লেখকসমাজ কথাসাহিত্য রচনা করেই তাঁদের দ্রোহ ও ব্যতিক্রমধর্মিতা প্রতিপন্ন করতে•চেয়েছেন। *কল্লোলের* প্রবণতা ও কর্মধারা জীবনানন্দের অজ্ঞাত ছিলোনা; তাঁর মতো বিজন অন্তঃপুরবাসী লেখকও *কল্লোল* অফিসে প্রায়ই যেতেন, এক-দুবার নয়—অচিন্তকুমারের প্রতিবাদ করে জীবনানন্দ বলেছেন— বহু বহু বার। *কল্লোলের* এই আবহ ও প্রণোদনা জীবনানন্দকে উপন্যাস লেখায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে, যদিও তাঁর উপন্যাসের থিম বা আঙ্গিকের সঙ্গে *কল্লোলের* কথাশিল্পীদের যোগ অকিঞ্চিৎকর।

উপন্যাসে জীবনানন্দ, কলকাতা শহরের সঙ্গে যুক্ত করে সংবেদনশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাপনের বাস্তবকে ঝোঝর ও পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা তাঁর দু-পর্বের উপন্যাসেই আছে। প্রথমপর্বের উপন্যাসগুলো তিরিশের দশকে লিখিত, দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসমালা চল্লিশের দশকে। প্রথম পর্বে তিনি লেখেন: *কারুবাসনা* (১৯৩৩) ; *জীবনপ্রণালী* (১৯৩৩), *বিভা* (১৯৩৩), *প্রেতিনীর রূপকথা* (১৯৩৩), *নিরুপম যাত্রা* (১৯৩৩); আর দ্বিতীয় পর্বে: *মাল্যবান* (১৯৪৮), *জলপাইহাটি* (১৯৪৮), *বাসমতীর উপখ্যান* (১৯৪৮)। প্রায় সব উপন্যাসে জীবনানন্দ একটিমাত্র তথ্য তুলে ধরেন এবং অর্থপূর্ণ একটি উপলব্ধি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। তথ্যটি তুলে ধরার জন্যে তাঁর উপন্যাসে একাধিক বিপরীতধর্মী চরিত্রের সমাবেশ ঘটে; আর অর্থপূর্ণ উপলব্ধিটি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কখনো সংলাপের, কখনো লেখকের সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ প্রসূত বিবরণ প্রক্রিয়ার, কখনো মনোলগের দ্বারস্থ হন। তথ্যটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিবিষয়ক এবং সেই ব্যক্তির জীবনের ব্যর্থতা সম্পর্কিত।

জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়কেরা কলকাতা শহরে চাকরির খোঁজে বছরের পর বছর ব্যয় করেছে, কিন্তু চাকরি যোগাড় হয়নি; যদিও এই ব্যর্থতার জন্যে জীবনানন্দের কোনো উপন্যাসের কোনো নায়কেরই বিরাট কোনো সন্তাপ নেই। এই ব্যর্থতার জন্যেই নায়কদের জীবন বিপন্ন, কিন্তু সেই বিপন্নতার সম্পূর্ণ ভাষ্য উপন্যাসে অনুপস্থিত। জীবনানন্দ আলো ফেলতে চেয়েছেন নায়কের অনুভবলোকের ওপর, যে-অনুভব সরব কিংবা অরব কবির মতো: কল্পনাশীল

মানুষের মতো। জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে পরিচয় থাকলে এই বোধকে খুব আলাদা মনে হবেনা। জীবনানন্দ সমাজ, সভ্যতা, আধুনিকতা ও আধুনিকায়নের[২] মধ্যে হৃদয়হীনতার-কল্পনাহীনতার-দুঃখহীনতার একটি সূত্র খুঁজতে চেয়েছেন এবং বিবর্ধমান নগর কলকাতায়, সেই সূত্র, তাঁর চোখে হরফে হরফে মিলেছে। জড় নগরীর মধ্যে এক খণ্ড হৃদয় তিনি বা তাঁর নায়ক[৩] খুঁজে পায়নি। হৃদয় খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যা করতে পারতো তাঁর নায়কেরা, কিন্তু করেনি; আট বছর আগে একদিন কবিতার নায়ক আত্মহত্যা করেছিলো- অথচ বধূ ছিলো তার পাশে, শিশুটিও ছিলো; তবু তাকে ভূতে পায়, তবু সে আত্মহত্যা করে। *জীবনপ্রণালী কারুবাসনা নিরুপম যাত্রা মাল্যবান জলপাইহাটির* নায়কেরা সকলেই ব্যর্থ; তবু তারা বড়ো কেউ নয়, বিশাল প্রতিভাবান অসামান্য কেউ নয়, হয়তো আর দশজনের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল, ভাবনা-কল্পনায় অগ্রসর; কিন্তু তার বেশি নয়। সেজন্যে এসব নায়কের স্ত্রীরা দারিদ্র্যের কশাঘাতে শীর্ণ-শরীর হতে থাকে, ছেলেমেয়েরা অকালে ব্যাধিগ্রস্ত—এমনকি মরে যায়, নিজের জন্যে দুধ কিংবা বউয়ের জন্যে পান-জর্দা কিনে দেয়ার পয়সা পর্যন্ত থাকেনা, সিনেমা দেখার জন্যে বউয়ের সিঁদুর কৌটা থেকে টাকা তুলে নিতে হয়, এতোসব গ্লানির পরও তারা আত্মহত্যা করেনা; দারিদ্র্যে-অসুখে স্ত্রী কখনো মরেও যায়, তবু আত্মহত্যা করেনা। নায়কের সহপাঠীদের অধিকাংশ শুধু প্রতিষ্ঠিত নয়—বিত্তশালী, ধনাঢ্য; তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে, কথাবার্তা হয়, তারা তাকে করুণা করে, দামী চুরুট খেতে দেয়, কখনো দু-চার টাকা; তবে একশো টাকা চাইলে কেউ দেয়না। জীবনানন্দের কোনো নায়ক পৃথিবীর সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত নয়, তারা মেঠো-ইঁদুরের মতো মনে করেছে নিজেদের; তাঁর নায়কেরা আত্মহত্যা করেনা, বরং প্রকৃতির ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্য, শুধুমাত্র দেখে, কিংবা কেবলমাত্র ভেবে, আয়ুক্ষেপন করে যায়।

প্রথমপর্বের উপন্যাসে জীবনানন্দ ছোটো পরিসরে কাজ করেছেন, সেই পরিসরকে আরো সংহত, সংকুচিত ও সংক্ষিপ্ত করলে হয়তোবা কবিতায় উত্তীর্ণ হতো পুরো ব্যাপারটি; তবে দ্বিতীয়পর্বে[৪] জীবননান্দ চলে গেছেন অপেক্ষাকৃত বড়ো, পল্লবিত, উপন্যাসোপম পরিসরে। প্রথমপর্বের উপন্যাসমালায় জীবনানন্দের নায়কেরা হতাশ, ব্যর্থ, অপ্রতিষ্ঠিত; প্রায় সবাই চাকরির খোঁজে গ্রাম ছাড়ে, এবং কলকাতায় মেসে গিয়ে ওঠে; চাকরি জোটেনা বলে টিউশন দিয়ে ক'মাস মেসের অন্ধকার, আশাভরসাহীন, অনিশ্চিত জীবন চালিয়ে নেয়; চাকরির সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হবার পর ফের গ্রামে ফিরে যায়। নায়কদের বয়েস তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে; নায়কেরা বিবাহিত, সাধারণত একটি সন্তানের জনক; প্রধান নির্ভর বাবা; বাবার আশ্রয়ে দাম্পত্যজীবন, সংসার, রোজকার খাওয়া-পরা; নায়কের বাবা স্কুল

শিক্ষক, দরদী, উপনিষদচালিত, গ্রন্থপ্রেমিক। নায়ক এম. এ. পাশ, এবং কারুতান্ত্রিক, লেখক। এই কারুতন্ত্র চাকরি বিরোধী, ঔপন্যাসিকের মতে; কারুস্বভাবী হওয়ায় নায়ক নিরুদ্যম, সংসারজীবনে অদক্ষ; কারুতন্ত্রী নায়ক সামাজিক ব্যর্থতা, চাকরি না-জোটা ও অচরিতার্থতাকে স্বপ্ন দিয়ে কল্পনা দিয়ে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করে।

দুই

জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি উপন্যাসের কাহিনী-অংশ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমপর্বের একটি উপন্যাস: *কারুবাসনা* (১৯৩৩)। *কারুবাসনা* উপন্যাসে ঘটনা প্রায় কিছুই ঘটেনা; চরিত্রগুলোর জীবন নিরুত্তাপ, রোমাঞ্চহীন, নিস্তরঙ্গ। এম. এ. পাশ নায়ক চাকরির খোঁজে কলকাতা গেছে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন; গ্রামে তাঁর কোনো কাজ নেই, বাবা স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তিনি মাঝে মাঝে বাবা অথবা বউয়ের সঙ্গে খাপছাড়া কথা বলে সময় কাটান, নতুন-পুরনো বইপত্র নাড়াচাড়া করেন, খড়ের জানালায় বসে কেবলি তাকিয়ে থাকেন বাইরে, বিকেলের আলো-আভায় শরৎ-হেমন্তের রূপ চোখে পড়ে একেকবার। হেমের স্ত্রীর নাম কল্যাণী: হেমের কাছে কল্যাণীর বিশেষ কোনো দাবি নেই, সে চায় কেবল ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের ঘর-গেরস্থালি। সেটাও সম্ভব হয়না। এর মধ্যে হেমের অবস্থাপন্ন দাম্ভিক মেজকাকা তাদের বাড়িতে আসেন; তিনি চাইলেই একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন হেমের, কিন্তু করেন না। 'হেম' ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা : জীবনানন্দের কোনো উপন্যাসের নায়কই ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। *কারুবাসনায়* পিতা-পুত্রের ঈশ্বরবিষয়ক আলাপ এইরকম [দেবেশ রায় ১৯৮৬ : ৪৩]

(বাবা) : মন্দ বলোনি কিন্তু আমি তো পরলোকে বিশ্বাস করি।
(হেম) : আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।
(বাবা): পারলে না?
(হেম) : মৃতুর পর কী আর থাকে?
(বাবা) : থাকে বই কি, সমস্তই থাকে; আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদের
(হেম) : পনিষদ যারা তৈরি করেছেন তাঁরা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেন নি তো; রক্তমাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে ধারণা তাঁদের ভালো লেগেছে তা-ই ব্যক্ত করে গেছেন; তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখিনা।

মেজকাকা সুরেশ মদ্যপান করেন, হেমের চাকরির অনুরোধে তিনি ক্রুদ্ধ হন, উপরন্তু বলেন : 'যেমন তুমি, তেমন তোমার বাবা, বায়ুভূত নিরালম্ব জীব। ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, আর কী, পরকালে কপাল খুলবে [দেবেশ রায় ১৯৮৬ : ৩৬]।' *কারুবাসনা*-র হেম-এর চাকরি কখনো, কোনোভাবেই, হয়না; যদুনাথের মতো মূর্খ লোক তাকে বলে চামার হতে, ডিমের ব্যবসা করতে, মোটর ড্রাইভার হতে, এমনকি চাষা হতে।

কারুবাসনার নায়ক লক্ষ করে তার জীবনের কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজন নেই; সে তার স্ত্রীর দিকে তাকায়, দেখে তার জীবনও ব্যর্থ হয়ে গেছে; নিজের মেয়ের দিকে তাকায়, দেখে ভবিষ্যতে স্কুলমাস্টারের বেশি কিছু সে হতে পারবেনা। একটা অবসাদ, ক্লান্তি, তাকে গ্রাস করে, ইচ্ছে হয় আত্মহত্যার। *কারুবাসনার* নায়ক আত্মহত্যা করেনা. তবে একই বছরে রচিত *নিরুপম যাত্রা*-র (১৯৩৩) নায়ক 'প্রভাত' কলকাতার অন্ধকার মেসে মারা যায়।

জীবনপ্রণালী (১৯৩৩) উপন্যাসের নায়ক শচীন, বয়েস চৌত্রিশ, বিবাহিত, স্ত্রীর নাম অঞ্জলি; শচীন একসময় সাংবাদিক ছিলো, সম্প্রতি চাকরিহীন; শচীনের সহপাঠীরা উত্তরকালে নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু শচীনের কোনো ব্যবস্থা হয়না, মাস্টারি ও নয়। শচীন হঠাৎ একদিন একশো টাকা পেয়ে যায়, লটারীর মতো; রজনীকান্ত খাসনবীশ ভুল করে তার নামে এই টাকা পাঠান। শচীন ও অঞ্জলি পাওয়ামাত্র সে টাকা খরচ করে ফেলে; কিছুদিন পর রজনীবাবু চিঠি লিখে জানান যে, ভুলবশত ওই টাকা শচীনের নামে গেছে, তা যেন অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হয়। শচীন ও তার বাবা ধার করার তদবির চালায় বিভিন্ন স্থানে; শচীন পরিচিত লোকজনের কাছে ধরনা দেয়, শ্রীবিলাসের কাছে, প্রতিমার কাছে - কেউ দেয় না। এই রকম অবস্থায় আর কতদিন বা কতদূর পর্যন্ত বেঁচে থাকা যায়- এধরনের একটা ক্লান্ত ও করুণ জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিয়ে *জীবনপ্রণালী* (১৯৩৩) উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে।

শচীনের জীবন আগাগোড়া ব্যর্থ, সেই ব্যর্থতা এমনকি মহৎ ব্যর্থতাও নয়; ঔপন্যাসিক কোনোরকম মহত্ত্ব যুক্ত করেন নি ওতে; জীবনের অন্য প্রান্তে উল্লেখযোগ্য উচ্চতা বা বিরাটত্ব থাকলে সে-মানুষের ব্যর্থতা যেরকম মর্মপীড়ক হয়, শচীনের ব্যর্থতা তার চেয়ে ভিন্ন, কিন্তু ভিন্নও নয়. এরকম পরিস্থিতিতে শচীনের আত্মোপলব্ধি [দেবেশ রায় ১৯৮৭ : ৮৫] :

> পৃথিবীতে চৌত্রিশটা বছর কাটালাম। অনেক বই পড়েছি, অনেক মতামত বুদ্ধিবিচারের সংঘর্ষে এসেছি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে—তারপর দেখলাম সাধারণের পক্ষে আমি কোন দিক দিয়েই চলিনা। সকলে বিধাতাকে বিশ্বাস

করে, অন্তত তাকে মঙ্গলময় বলে, আমি সৃষ্টির সম্পর্কে আমার ব্যথিত সমস্যা নিয়ে দিন কাটাই। ......

পূর্ণিমা (১৯৩৩) রচনাকালের দিক থেকে *জীবনপ্রণালীর* (১৯৩৩) সমসাময়িক। চামেলি, পূর্ণিমার বড়ো বোন; আশ্রম স্কুলের শিক্ষিকা ছিলো সে, পরে ছেড়ে দেয়; কিন্তু এর মধ্যে চামেলির বিয়ে হয়ে যায় বম্বের বিরাজ ডাক্তারের সঙ্গে। বিয়ের পর চামেলির গোটা জীবনটাই বদলে যায়, চামেলি প্রবেশ করে এক "অপরূপ অসামান্য সম্পন্ন জীবনে"; কিন্তু পূর্ণিমা ও সন্তোষ দুঃখ-দুর্ভোগে নিঃস্বতার চরমে পৌঁছয়, জীবনকে 'একটা বিপুল তামাশাবোধ' ছাড়া আর কিছু মনে হয় না তাদের। চামেলি-বিরাজ দু'জনেরই বয়েস পূর্ণিমা-সন্তোষের চেয়ে ঢের বেশি, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যে তারা সজীব, এবং নতুন; বয়স তাদের ছুঁতে পারেনা। পূর্ণিমা সন্তানসম্ভবা ; মেসের অন্ধকারে সন্তোষ ভাবে, প্রসবকালে পূর্ণিমার মৃত্যু হলে ভালো একটা সমাধান হয়, দু'জনেই বেঁচে যায়। উপন্যাসের শেষে সন্তোষের অনুমান সত্যে পরিণত [দেবেশ রায় ১৯৮৭ : ১৮২] :

> সন্তোষের চোখে সমস্ত পৃথিবী যেন নরম, কোমল, মধুর ও নিবিড় হয়ে উঠেছে; পূর্ণিমা সেই খোড়ো ঘরের ভিতর পা ছড়িয়ে রুদ্ধ হয়ে নেই আর। প্রসবের ভোরের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রেতিনীর রূপকথার [দেবেশ রায় ১৯৮৭] (১৯৩৩) নায়ক ইংরেজিতে এম. এ. পাশ ; নায়ক সাহিত্যপাঠে বিভোর এক ব্যক্তি—হয়তো, কিংবা সেজন্যেই, তার সামাজিক জীবন ব্যর্থ ; চাকরিহীন : এককালে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, কিন্তু এখন ওসব স্মৃতি মাত্র ; বছরের পর বছর নায়ক চেষ্টা করেছে চাকরির, কিন্তু জোটেনি ; মিথ্যে কথা বলে মালতীকে বিয়ে করে নায়ক, কিন্তু বিয়ের পর সবই বুঝতে পারে মালতী। নায়ক ইংরেজি সাহিত্যে অভিজ্ঞ, জর্মনও জানেন ; টোমাস মানের *বাডেনব্রুক্স* তাঁর প্রিয় বই, কারণ *বাডেনব্রুক্স* 'একটা অভিজাত বংশ কী করে নষ্ট হয়ে গেল, তারই ইতিহাস'। নায়কের মনে হয়, ইংরেজিতে এম. এ. পাশ না করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলে ভালো হতো, মাঝে মাঝে জুতো সেলাই শেখারও ইচ্ছে হয়েছে। অলডাস হাক্সলীর একটা বইয়ের রিভিয়্যু করতে গিয়ে জীবনানন্দ হাক্সলীর প্রবন্ধে দেখেছিলেন 'অক্লান্ত বিদ্যাবয়ন বুদ্ধিস্ফুরণের চলাচল', আর উপন্যাসে 'অনেক ছড়ানো বাঁধানো নিবন্ধ' কিন্তু আজ অনায়াসে জানা যাচ্ছে, ওরকম ছড়ানো-বাঁধানো নিবন্ধ জীবনানন্দের উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে।

বিভা (১৯৩৩) রচনারীতির দিক থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। বিভা একটা মেয়ের নাম, সম্পন্ন ঘরের সংবেদনশীল ঈশ্বরবিশ্বাসী মেয়ে, মেসের জানলা দিয়ে বিভার জীবন ও জীবনযাপন যতটুকু দেখা ও বোঝা যায়, জীবনানন্দ তার বিবরণ দেন। তবে মেসের জানালা ও বিভার ঘর মাঝে মাঝেই যে মিশে যায় নি, এমন নয়। বিভার কাছে অনেক ধরনের লোক আসে, তাদের সঙ্গে বিভার কথাবার্তা চলে। অনেক সময় মনে হবে, বিভা যেন এমন এক মেয়েমানুষ, যে অবিরাম সাক্ষাৎকার দিয়ে চলেছে, আর জীবনানন্দ জানালার উপরে বসে জার্নালিস্টের মতো তা টুকে রাখছেন। বই বিষয়ে অক্লান্ত আলাপ জীবনানন্দের উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য, *প্রেতিনীর রূপকথার* মতো *বিভা*-উপন্যাসেও তা ভালোভাবে আছে।

একযুগের বেশি সময় পর জীবনানন্দ আবার উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেন, এগুলোকেও দ্বিতীয়পর্বের উপন্যাস বলা যায়। *বাসমতীর উপাখ্যান* (১৯৪৮) *জলপাইহাটি* (১৯৪৮) ও *মাল্যবান* (১৯৪৮) — জীবনানন্দের দ্বিতীয়পর্বের রচনা। *বাসমতীর উপাখ্যান* (১৯৪৮) আয়তনে বিপুল, চরিত্রও অনেক, বিষয়ের দিক থেকেও খানিকটা আলাদা। ব্যক্তিগতের বাইরে ব্যাপ্ত যে সমাজ ও প্রতিবেশ, তার দিকে জীবনানন্দের আগ্রহ কিছুটা বেড়েছে বোঝা যায়। *বাসমতীর উপাখ্যানের* পটভূমি দেশভাগকালীন বাংলাদেশ; কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্ধার্থ; তবে পরিপ্রেক্ষিত-চরিত্র বাসমতীতে বেশি এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের কেন্দ্রে মফস্বলশহর বাসমতী, এবং তার অধিবাসী কয়েকজন মানুষ : সিদ্ধার্থ, রমা অধিকারী, প্রভাসবাবু, কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, মিশনারী প্রতিষ্ঠানের বার্থেলো, ও মাদাম ভালোরি। সিদ্ধার্থ গরিব অধ্যাপক, তার স্ত্রী সুনীতি। এককালে সিদ্ধার্থের বাড়িতে জনসমাগম ছিলো প্রচুর, এখন নেই। এখন কয়েকজনমাত্র মানুষ তারা : সুনীতি, ছেলেমেয়ে, সরোজিনী, ছাতুকাকা, টিনি মজুমদার ও সিদ্ধার্থ—তাদের মিল এক জায়গায় : কারো কাছে টাকা নেই। বাসমতীতে সিদ্ধার্থের প্রতিবেশী রমা অধিকারী ও তার বাবা প্রভাসবাবু। রমার প্রতি সিদ্ধার্থের দুর্বলতা আছে, কিন্তু সে সংযত। রমার বয়স উনিশ, বি-এ-র ছাত্রী; চেহারা 'গভীর, নিবিড়, বাসমতী ধানের মতন'। সিদ্ধার্থ মনে মনে চায় রমা কলকাতায় না গিয়ে বাসমতীতেই থেকে যাক, কারণ নগর তাকে নষ্ট করে ফেলবে, নগরে তার বিকাশ বিশুদ্ধ হবে না। সিদ্ধার্থের বয়েস চুয়াল্লিশ, রমার দিকে তার গাঢ় মনোযোগ অবাঞ্ছিত, তবু মাঝে মাঝে সিদ্ধার্থের 'মন নাড়া খেয়ে' ওঠে। রমার সঙ্গে সিদ্ধার্থের আলাপ জমে ওঠে মূলত বইপত্রকে কেন্দ্র করে; কলেজে কোন বইটা আছে এবং নেই, কোন বই কে পড়েছে বা পড়েনি, রোমান কবি লুক্রেশিয়াসের বই কেন মিলছেনা, অধ্যাপকদের বিদ্যাচর্চার কি অবস্থা-ইত্যাদি। *বাসমতীর উপাখ্যানে* জীবনানন্দ দেশভাগের সংকট তুলে ধরেছেন নানাস্থানে; বাসমতী কলেজের অধ্যক্ষ

মনে করেন, 'স্বাধীনতা কেউ অর্জন করবে না, কুড়িয়ে পাবে'; সিদ্ধার্থের আশংকা [দেবেশ রায় ১৯৮৮ : ১১৪] :

> দেশ স্বাধীন হল বলে ভালো লাগবে আমাদের, কিন্তু অন্যসব দিক থেকে খুবই খারাপ লাগবে। সপরিবারে মরেও যেতে পারি। বাসমতীতে কলেজের কাজে থাকলে খেয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খানিকটা আছে বটে, কিন্তু কলকাতায় গেলে সপরিবারে শেষে মারা যাব।

জীবনানন্দের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় বাসমতীর সিদ্ধার্থ অপেক্ষাকৃত সক্রিয়, উদ্যমী, চেষ্টাশীল। বাসমতীতে অনেক কাজ করার স্বপ্ন তার, কিছু কিছু করেছেও ; যেমন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, তাঁতকল বসানো, সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান, নাইট স্কুল ইত্যাদি। অন্য উপন্যাসের নায়কেরা চাকরির খোঁজে কলকাতায় গেছে, কিন্তু সিদ্ধার্থ যায় নি, চাকরি খোঁজেনি, মফস্বলের শিক্ষকতায় সে তৃপ্ত, এবং তার স্বপ্ন নগর-বিকেন্দ্রিক। কিন্তু এর ভেতর একটা প্রবোধও আছে, সেই প্রবোধের বিষন্ন প্রতীক হয়ে উঠেছে 'বাসমতী' নামক মফস্বল শহর।

জলপাইহাটি (১৯৪৮) উপন্যাসে নিশীথ 'জলপাইহাটি' নামক মফস্বল শহর ছেড়ে কলকাতায় উঠেছে জিতেন দাশগুপ্ত নামের এক ঐশ্বর্যশালী বন্ধুর বাড়িতে। নিশীথ মফস্বল শহর জলপাইহাটিতে কলেজের দরিদ্র অধ্যাপক; কলকাতায় এসেছে চাকুরির ধান্ধায় ; কলেজের চাকরি ছেড়ে, কলকাতায় কোনো একটা কাজ জুটিয়ে, বউ-সংসার নিয়ে জীবনযাপন করবে—এই তার মস্ত অভিলাষ। কিন্তু নিশীথকে দামিয়ে দেয় বিভিন্ন বাস্তব কারণ : তার বিলিতি ডিগ্রি নেই, টেকনিক্যাল জ্ঞান সে অর্জন করেনি, ডাক্তারি আইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েনি, কাজেই চাকরি তার ভাগ্যে থাকার কথা নয়।

জিতেন অফিসে চলে যাওয়ার পর তার স্ত্রী নমিতা নিশীথকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে, ওপরে তাদের ঘরে নিয়ে যায়, পাশাপাশি সোফায় বসে তারা আলাপ করে, দু-জনেই সিগারেট ধরায়, নমিতা নিশীথকে যত্ন করে খাওয়ায়, এটা-ওটা নিতে বলে, তারপর নমিতার গাড়িতে করে নিশীথ বেড়াতেও যায়, দুপুরবেলা ফিরে দু-জন একসঙ্গে খায়, বই পড়ে, আলাপ-অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে, নমিতা-নিশীথ একেবারে কাছাকাছি-ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়; কিন্তু তবু কোনো ঘটনা ঘটেনা। জিতেন অফিস থেকে ফেরেন না, আরো অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ হয় দু-জনের, কিন্তু কোনো ঘটনা ঘটেনা। নমিতা প্রচণ্ড আধুনিকা মেয়েমানুষ, জর্মন-ফরাশি জানে—তার কাছে নিশীথ অত্যন্ত সাধারণ, তুচ্ছ, এবং গরিব। নিশীথ চাকরির তদবিরে

কলকাতায় এসেছে, এই প্রসঙ্গটুকুও সে নমিতার সামনে তোলেনা। চাকরির চেষ্টা এক সময় শুরু করতেই হয় নিশীথের, কিন্তু মাস্টারি ছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা সে দেখেনা, এবং তার বেতন জলপাইহাটির চেয়ে কম।

উপন্যাসের শেষ অংশে নিশীথের বাউন্ডুলে বিপ্লবী পুত্র জলপাইহাটিতে ফিরে আসে, জলপাইহাটিতে তার বিপ্লবের ব্যাধি দূর হয়, তার মায়ের ছোটো বোন অর্চনার প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। অর্চনাকে আগে মাসি ডাকতো হারীত, এখন ডাকেনা ; নিশীথের প্রতি অর্চনার একটা দুর্বলতা ছিলো, সেই দুর্বলতা হারীতের মধ্যে দিয়ে চরিতার্থ হতে চায়। একে হারীত ব্যাখ্যা করে 'স্ত্রীলোকের মনের প্রসার' বলে। অর্চনাকে হারীত বলে, তার "শরীরটা মেরামত করে দিতে', এমনকি 'স্থির সম্পর্কের' কথাও।

উপন্যাসের শেষ দু'পৃষ্ঠায় দেখা যায়, জলপাইহাটিতে নিশীথ ফিরে এসেছে ; তার স্ত্রী সুমনা মারা গেছে। স্ত্রীর মৃত্যু, জীবনানন্দের প্রায় সমস্ত নায়কের জন্যে এক বাঞ্ছিত ঘটনা। স্বাভাবিকভাবে সুমনার মৃত্যু নিশীথকে বিচলিত করেনা, বরং রসিকতা করে জুলেখাকে সে বলে : জুলেখা ওয়াজেদ আলীকে বিয়ে না করে আমাকেই তো করতে পারতো, আমার স্ত্রী তো মারা গেলো। উপন্যাসটি এভাবে এবং এখানেই শেষ—জলপাইহাটির নিশীথ কলকাতায় চাকরি পায়নি।

মাল্যবান (১৯৪৮) এপর্বের অপেক্ষাকৃত ছোটো, অপেক্ষাকৃত সুলিখিত উপন্যাস। *মাল্যবান*-কে অনেকে আত্মজৈবনিক রচনা বলেন, কিন্তু জীবনানন্দের কোন উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক নয় ? ঘটনা বা বাস্তবতার হেরফের হলেও বিশেষ মুদ্রাযুক্ত অনুভূতির দিক থেকে তাঁর সকল উপন্যাসই আত্মজৈবনিক। 'সকল মহৎ উপন্যাসই আত্মজৈবনিক'—এক বিশ্রুত ফরাশি কথাশিল্পীর এই ঘোষণা মনে রেখেই আমরা বলবো : আত্মজৈবনিক হওয়া বা না হওয়া কোনো উপন্যাসের দোষ বা গুণ নয়। *মাল্যবানের* ঘটনাংশ এরকম : মাল্যবানের স্ত্রী উৎপলা, এবং তাদের মেয়ে মনু—এই হলো উপন্যাসের পারিবারিক ছবি। মাল্যবান এবং উৎপলা বিষম ধাতুতে গঠিত, উভয়ের বনিবনা নেই ; মাল্যবান নিচের ঘরে একা থাকে, উৎপলা উপরের ঘরে ; মাল্যবানের ঘরটা অন্ধকার, মশা ইঁদুর আরশোলা ও ছারপোকায় ভরা—উৎপলার ঘর বেশ গুছানো, ধবধবে দেওয়ালে ছবি টাঙানো আছে, একদিকে তার বাবার একটা ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট, অন্য পাশে মা-র একটা অয়েলপেইন্টিং ; ঘরের ভেতর একটা পালিশ করা মেহগনি কাঠের খাট, খাটের পুরু গদির উপর তোশকে বকপালকের মতো সাদা বিছানার চাদর। মাল্যবান অনেক চেষ্টা করেও উৎপলার কাছে নিজেকে 'স্নেহশ্রদ্ধার মানুষ' করে তুলতে পারেনি। মাল্যবান স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন : এই বিচ্ছিন্নতা উৎপলার তৈরি।

মাল্যবানকে উৎপলা তার শরীর ব্যবহার করতে দেয়না, জৈব তাড়নায় মাল্যবান কাতর-উন্মাদ হয়ে ওঠে একেকবার ভিক্ষুকের মতো; তবু উৎপলা শরীর ব্যবহার করতে দেয়না, বেশ্যা এনে শেয়ার করার কথাও বলে। বিয়ের পর থেকে বারো বছর এভাবেই চলছে। উৎপলার আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে এলে মাল্যবানকে মেসে গিয়ে উঠতে হয়; তবু মাল্যবান সহিষ্ণু, স্ত্রীর আদর আর অনুকম্পার জন্যে তৃষিত। পৌষের শেষাশেষি উৎপলার মেজদা ও বৌদি এসে উঠে মাল্যবানের কলেজ স্ট্রীটের বাসায় ; মেজদা এবং বৌদির কথাবর্তায় মাল্যবান লক্ষ করে 'যৌনসম্বন্ধের মিছরিমাখানো ভালোবাসার মর্ম', এবং এই বস্তু যে তার নেই আরো ভালো করে উপলব্ধি করে মাল্যবান।

সাত মাস বেড়িয়ে মেজদারা চলে যায়, মাল্যবান মেস ছেড়ে আবার নিচের ঘরটাতে এসে উঠে। এসে দেখে, উৎপলার কাছে রোজ একটা লোক আসে— অমরেশ ; অনেক রাত পর্যন্ত উৎপলার ঘরে কাটায়। মাল্যবান কিছুই বলেনা।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় অমরেশ বিষয়ে উভয়ের উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা চলছে ; কিন্তু হঠাৎ মাল্যবান লক্ষ করে উৎপলার 'ইচ্ছুক অনুগত শরীর', মাল্যবান ও উৎপলা বিছানায় গিয়ে শোয়, শীতরাতের এই বিছানা জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে বোধ হয় মাল্যবানের, তারপর খড়ের বিছানায় হাঁস-হাসিনির মতো উমে বিভোর এই দম্পতি কোরাসের ধরনে ক্রমাগত উচ্চারণ করে [দেবেশ রায় ১৯৮৫ : ১১৩] :

কোনোদিন ফুরুবেনা শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
না, না, ফুরুবেনা।
কোনোদিন ফুরুবেনা শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
না, না, ফুরুবেনা।
কোনোদিন ফুরুবেনা শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
ফুরুবেনা। ফুরুবেনা, কোনোদিন—

সেদিন শীতের রাতে মাল্যবান কি ব্যবহার করতে পেরেছিলো উৎপলার শরীর ? দু-জনেই কি শুয়েছিলো একই বিছানায় ? উৎপলার ঘরে সত্যি শুতে পেরেছিলো মাল্যবান ? সঠিক করে বলা মুশকিল ; উপন্যাসের শেষতম বাক্যগুচ্ছ আমাদের হতাশ করে দেয় ; আমরা বুঝি মাল্যবান স্বপ্নের ঘোরেই শুয়েছিলো ওপরের ঘরে, উৎপলার সঙ্গে, এক বিছানায়, ব্যবহার করতে পেরেছিলো উৎপলার শরীর, করেছিলোও; কিন্তু সবই সম্ভবত স্বপ্নে : পুরো উপন্যাসে মাল্যবান একবারও উৎপলার শরীর ব্যবহার করতে পারেনি।

তিন

জীবনানন্দ প্রায় সব উপন্যাসেই একজন ব্যর্থ মানুষের ছবি টাঙিয়ে ধরেন আগাগোড়া ; ব্যর্থ মানুষটি অধিকাংশ সময়ে লেখক অথবা লেখকের মতন— স্পষ্টত সংবেদনশীল, সাহিত্যতৃষ্ণায় কাতর ; ব্যর্থ মানুষটি মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তের চেয়ে খারাপ, এবং ব্যর্থ মানুষটির কোনো ভবিষ্যত নেই। ব্যর্থ মানুষটি যা-কিছু করে, তা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। জীবনানন্দের উপন্যাসে ব্যর্থমানুষের ভাবনা-উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে শব্দের-বাক্যের দীর্ঘ একটানা অনন্ত বিস্তার ঘটেছে। একরকমের বোধ, অনুভব ও উপলব্ধি পুনরাবৃত্ত ; সংলাপের পর সংলাপ বিন্যস্ত, কিন্তু সে সংলাপ বাখতিন-উল্লিখিত [Bakhtin 1981 : 251-60] কোনো 'পলিফনি' তৈরি করেনা। সংলাপগুলো তালিকার মতো সাজানো আছে তাঁর উপন্যাসে; তাতে চরিত্রগুলোর অন্তর-বাইরের সংবাদ নেই। চরিত্রগুলো অফুরন্তভাবে কথা বলেছে, কিন্তু মনে হয় চরিত্রগুলোর আলাপের অভ্যেস নেই ; মনে হয় একটিমাত্র চেনা-নিয়ন্ত্রক-স্বর সবার কথা ও কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সংলাপের বাক্য দীর্ঘ এবং আলাপের ভঙ্গি শীতল, নিরুত্তাপ, মন্থর ; বাক্য নিয়ে তরুণ নিরীক্ষাশীলেরা যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, চরিত্রের কথোপকথনে সেই রকম বাক্যনিরীক্ষা জীবনানন্দের সকল উপন্যাসে পাওয়া যায়। জীবনানন্দের নায়কেরা নিরীক্ষাপূর্ণ বাক্যে কথা বলে; সেই বাক্য কমা-কোলন-খচিত এবং জটিল। জীবনানন্দ সংলাপের ভেতরে ও বাইরে বারবার নিসর্গলোকের উপাদান সন্নিহিত করেছেন; সেই উপাদান একাধারে কাব্যিক, আকর্ষক এবং উপমার আচ্ছাদনে প্রীতিকর। তবে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে 'প্রকৃতি' যে রকম চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত, জীবনানন্দে তা নয়; জীবনানন্দের উপন্যাসে প্রকৃতি নিছকই আলংকারিক শোভা।

জেন অস্টেনের একটা উপন্যাসে[৫] পড়েছিলাম : 'তুমি জান, একজন মানুষ খুব কম কথাই বলবে। কিন্তু প্রায় তিরিশ মিনিট পাশাপাশি থেকে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ থাকা বেমানান।' এই অশোভনতা থেকে বাঁচার জন্যেই কি জীবনানন্দের চরিত্রগুলো কথার পর কথা সাজিয়ে গেছে ? আমরা প্রতিদিনের জীবনে কথাবার্তা বলি, সেই কথাবার্তারই একটা বিকল্প উপন্যাসে দেখা যায় *ডায়ালগ* বা 'সংলাপে'র আধারে। কথাবার্তার হুবহু উত্থাপন ঔপন্যাসিকের কাম্য নয় ; আডর্নো যেমন [Adorno 1974 : 17] *মিনিমা মোরালিয়ায়* বলেছেন, কথার উত্তাপ যদি লেখায় সঞ্চারিত না হয়, তাহলে তা মানবিক হয়ে ওঠেনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কথাবার্তা আর সংলাপ কি এক ? *কনভারসেশন* আর *ডায়ালগ* কি অভিন্ন ? তা যদি হতো মিখাইল বাখতিনের যুগান্তকারী উপন্যাসতত্ত্ব তৈরি হতো না। বাখতিন বলতে চান উপন্যাসের সংলাপ দৈনন্দিন কথোপকথন থেকেই তৈরি হয় ; কিন্তু তাতে থাকে

ভাষার অনেকরকম ভঙ্গি, বহুরকম কণ্ঠ ও কণ্ঠস্বর, সেজন্যে সংলাপে *সোশিও-লিংগুইস্টিক সিস্টেম* [Bakhtin 1981 : 294] বিপন্ন হতে বাধ্য; সংলাপে তাই একটি মাত্র স্থির ভাষা পাওয়া যায় না, ভাষার মুদ্রা ও কেন্দ্র বদলে যায়, তৈরি হয় 'ভাষারাশির সংলাপ'। উপন্যাসের সংলাপ ও তার ভাষায় এই বহুমুখিতা আছে বলে বাখতিন উপন্যাসকে একটা গণতান্ত্রিক শিল্পমাধ্যম [Davis 1989 : 166] মনে করেন। জীবনানন্দের উপন্যাসে এটা নেই, এই বহুমুখিতা নেই।

একথা আমরা বলতে চাইনা যে, সাধারণ কথোপকথন তুলে দেয়া উচিত ছিলো জীবনানন্দের, সাধারণ কথোপকথন কখনোই সংলাপ নয়। লেনার্ড ডেভিস [Davis 1989 : 162-90] তাঁর *রেসিস্টিং নভেলস* (১৯৮৭) বইতে দেখিয়েছেন, সাধারণ কথোপকথন এবং ডায়ালগের মধ্যে কি আকাশ পাতাল তফাত। বলেছেন, সাধারণ কথোপকথন উপন্যাসে তুলে ধরলে মনে হবে দু-জন মূর্খ কথা বলছে, এমনকি তা যদি হয় খুব সুশিক্ষিত দু-জন মানুষের, তবু। অবশ্য ইউরোপীয় সাহিত্যে এমন যুগ গেছে, যখন চরিত্রগুলো খুব মেধাবী কথা বলতো (ভাবতে পারি হ্যামলেট কিংবা ওফেলিয়ার কথা; জেন অস্টেনের চরিত্রগুলো যেন অভিধান দেখে দেখে কথা বলছে, এ রকম মনে হয়।

কথোপকথনে যে 'অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিত' বা *ইমেডিয়েট কনটেক্স্ট* থাকে, *ডায়ালগ* তা থেকে মুক্ত। কথোপকথন মুখোমুখি মুহূর্তের বন্দী ; ডায়ালগে যদিও লজিকের ব্যাপার আছে, তবু তা স্বাধীন। কথোপকথন একটা সামাজিক *ফর্ম*, কিন্তু সংলাপ *মনোলিথিক*। তবে *থিমের* ওপর একটা চেতন কিংবা অবচেতন নির্ভরতা সংলাপেরও থাকে। থিমের ওপর এই নির্ভরতা থেকে উপন্যাস তার *টেক্স্ট* তৈরি করে ; জীবনানন্দের উপন্যাসে সেটা হয়নি। জীবনানন্দের উপন্যাস *টেক্স্টের শর্ত* পূরণ করেনি—যেটা বঙ্কিমচন্দ্রের, মানিকের বিভূতিভূষণের, সতীনাথের, তারাশঙ্করের, ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস করেছে।

জীবনানন্দ দাশ যদিও ছদ্মনামে *পূর্বাশায়* উপন্যাস ছাপতে চেয়েছিলেন, কিংবা স্বনামে *দেশ* পত্রিকায়, উপন্যাসপাঠ ও বিচারের অভিজ্ঞতা জীবনানন্দের নগণ্য ছিলোনা। তাঁর উপন্যাসগুলো পড়লে দেখা যাবে তিনি টোমাস মান, হাক্সলী, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ফিল্ডিং, ভিক্টর হুগো, জোলা, জিদ, জেমস জয়েস প্রমুখ অসংখ্য লেখকের কথা অনবরত উচ্চারণ করেছেন; কারো কারো উপন্যাস বিষয়ে আকর্ষণীয় মন্তব্যও পাওয়া যায়। জীবনানন্দ অলডাস হাক্সলী[৬], টোমাস মান,[৭] আঁন্দ্রে জিদ[৮] বিষয়ে *রিভিয়্যু*-প্রবন্ধ লিখেছেন—শরৎচন্দ্র বিষয় তাঁর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে[৯] ; *দি সানডে হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড* কাগজে (*সেপ্টেম্বর ১৯৫০*) ইংরেজিতে তিনি ছোট্ট কিন্তু অর্থপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন [আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৮৩ : ৭] বাংলা

উপন্যাস বিষয়ে ; সর্বোপরি সহস্রাধিক পৃষ্ঠা কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যয় করেছেন যে- লেখক, উক্ত বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশ, এমনকি *এ্যামবিশন* অনুল্লেখযোগ্য হতে পারে না। জিদের *জার্নালে* জীবনানান্দ 'জ্ঞানোৎসারিত গভীর মেধাবী সমগ্রতা' পান নি, বৃত্তান্তশিল্পের সিদ্ধিও নয় ; টোমাস মানকে বড়ো ঔপন্যাসিক মনে করেন জীবনানন্দ, প্রমাণ করেন কেন টমাস মানের *ফস্টাস* গ্যেটের *ফাউস্টের* পুনর্ভাষণ নয়, ব্যাখ্যা করেন কিভাবে মান-এর 'বিশদ, আন্তরিক ও বড়োজাতের ভাবনা-প্রতিভা'র ফলে ফস্টাসের জীবনগল্পের ওপর নতুন আলো পড়েছে। *ডক্টর ফস্টাসে* টোমাস মানের বিষয় ছিলো সুরশিল্পী আড্রিয়ান লেফেরকুনের জীবন, আর জীবনানন্দের উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে এক ব্যর্থ, কিন্তু অনুভূতিপূর্ণ, বিবেকবান ব্যক্তির বৃত্তান্ত। অবশ্য বুদ্ধদের বসুর অধিকাংশ উপন্যাসে, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ভাষায়, যেরকম 'পোর্ট্রিট অফ এ্যান আর্টিস্ট' পাওয়া যায়, জীবনানন্দের উপন্যাসে সেভাবে সুস্পষ্ট লেখকমানুষের জীবন নেই ; কোনো কোনো উপন্যাসে বোঝা যায় বটে যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র লেখকমানুষ, কিন্তু অধিকাংশ উপন্যাসে ছড়ানো কেবল ইঙ্গিত, অস্পষ্ট ইশারা : কোনো উপন্যাসের *(বাসমতীর উপাখ্যান)* কেন্দ্রীয় চরিত্র টলস্টয়ের *ওয়ার এ্যান্ড পীসের* মতো উপন্যাস লেখা সম্ভবপর ভেবেছে, কিন্তু লেখেনি ; কোনো উপন্যাসের ("কারুবাসনা") প্রধানতম চরিত্র 'আধুনিক কবি' হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে ; কোনো উপন্যাসে বাংলা-ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দে গল্প-উপন্যাস লিখতে চেয়েছে *(জলপাইহাটি)*, কিন্তু উপন্যাস পড়ে সেই সম্ভাবনাকে নেহাত কথার কথা মনে হয়। *জোসেফ এণ্ড হিজ ব্রাদার্স* ও *ডক্টর ফস্টাস*— উপন্যাস-দুটোর প্রতীকাব্রু খুলে জীবনানন্দ দেখে নেন 'আজকের ক্লান্ত নষ্ট সভ্যতা'র চেহারা, এবং 'আধুনিকতার সময়যন্ত্রে ছিন্ন এক প্রকৃতিস্থ সৎ পুরুষের' হৃদয়। তাঁর নিজের উপন্যাসেও লেফেরকুনের মতো, পৃথিবীর শুভেচ্ছু 'এক নিঃস্বার্থ উদাস ও বিমর্ষ' মানুষ আছে বটে, কিন্তু জীবনানন্দ তার জীবনকে *টেক্‌স্টের* মর্যাদায় উত্তীর্ণ করতে পারেননি।

কিন্তু কাকে বলে *টেক্‌স্ট?*—আজকের দিনে আমাদের এই জিজ্ঞাসায় এবং তার জবাবে উপনীত হতে হবে। কারণ 'বই' বস্তুটি সম্পর্কে যে বোধ ইতিপূর্বে প্রত্যেকেরই ছিলো, তা খোয়া গেছে অচিরাৎ ; দু-মলাটের ভেতর রাশি রাশি নিরর্থ অক্ষর সমাবেশকেও এখন 'বই' বলা হয়। 'বই' বিষয়ে যখন এই ধারণা, *টেক্‌স্ট* বিষয়ে আমাদের কোনো বোধ না থাকবারই কথা। 'লেখকের মৃত্যু' [Barthes 1977 : 142-48] নামক প্রবন্ধে রোলা বার্ত (১৯১৫-৮০) লিখেছেন : *টেক্‌স্ট* হলো মূলত 'বহুমাত্রিক এক পরিসর', যে পরিসরে বহুরকম লিখন একত্রিত, জড়িত, পরম্পরিত, সম্পর্কেও সংঘর্ষে লিপ্ত। যে-বহুমাত্রিক পরিসরের কথা

বলছেন, সেই পরিসর জীবনানন্দের উপন্যাসে নেই—তাঁর কবিতায় বরং তা আছে বিপুলভাবে অর্থপূর্ণভাবে, কিন্তু উপন্যাসে কোথায় ?

আমাদের আলোচনার এই ভঙ্গি হঠাৎ করে নির্মম মনে হতে পারে ; কিন্তু আজকের পৃথিবীর সমালোচনা-তত্ত্ব নিজেও কি খানিকটা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেনি ? নীৎশে একবার বলেছিলেন 'ঈশ্বর মৃত'; এখন বিশ্লেষকেরা বলছেন 'লেখক মৃত' [Foucault 1977 : 123]। 'বই' এবং 'লেখক' শব্দদ্বয়কে 'আগে' এবং 'পরে' শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। 'বই'কে সর্বতোভাবে লেখক (তার মান, মর্যাদা, কিংবদন্তী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে *ফ্রি রিডিং* বা মুক্তপাঠের আওতায় আনত হচ্ছে ; তার কারণ 'বই' রচিত হওয়ার পর 'লেখক' হয়ে যান পূর্বেকার ব্যক্তি, আর *টেক্স্ট* পরবর্তী বস্তু; অন্যদিকে *টেক্স্টের* সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হচ্ছে পাঠকের. *টেক্স্ট* হয়ে যাচ্ছে *পাব্লিকের* সম্পত্তি। আজকে তাই পাঠ বদলেছে, পাঠ্যও বদলেছে। *হোয়াইট রাইটিং*[২৭] (১৯৮৮) বইতে কোয়েজি তাই বলেছেন [Coetzee 1988] যে, তিনি পড়তে যান : *টেক্স্টের* শূন্যস্থানগুলো, তার ওল্টানো অংশ; তার নিম্নতল, হারানো অন্ধকার বিপন্ন উপদ্রুত ও পরিবর্তিত অংশ।

জীবনানন্দের উপন্যাস এতোভাবে পড়া যায় না। জীবনানন্দের উপন্যাস সংস্কারমুক্ত স্বাধীন পাঠের অন্তর্ভূত করা কঠিন। কারণ এমনিতে আমরা কোনো বই পড়িনা , তার লেখককে পড়ি, তার কিংবদন্তীকে পড়ি, বইয়ে প্রতিফলিত আমাদের সংস্কারকে পড়ি, কাম্যকে পড়ি, আমাদের স্বপ্ন এবং সন্ত্রাসকে পড়ি। জীবনানন্দের উপন্যাস পড়তে গিয়েও সে-ঘটনাই ঘটবে ; জীবনানন্দের উপন্যাসে জীবনানন্দের কবিতা পড়বো, তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কিংবদন্তী পড়বো : উপন্যাসের নায়িকাগুলোকে মিলিয়ে নেবো তাঁর কবিতার সুরঞ্জনা-বনলতা-শেফালিকার সঙ্গে, আর নায়ক হিশেবে অধিষ্ঠিত দেখবো একজনকে : ইংরেজিতে এম. এ. পাশ কলেজ অধ্যাপক—বিবাহিত, অসুখী, এক কন্যা ছেলের অসম্পূর্ণ জনক, ট্রামস্পৃষ্ট, কবি জীবনানন্দ দাশ।

টীকা

১. সঞ্জয়কে লেখা চিঠি : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭। চিঠির কিছু অংশ এরকম :

'আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয় —ছদ্মনামে) *পূর্বাশায়* ছাপতে পারেন ; দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার জীবনস্মৃতি আশ্বিন কিংবা কার্তিক থেকে *পূর্বাশায়* মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে, কিন্তু টাকা এক্ষুণি চাই ...... [উদ্ধৃত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৬ : ২৯৫]।

২. জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির পরিবেশবাদী পাঠ সম্ভবপর। নিসর্গের বিভিন্ন বিন্যাসের ভেতর দিয়ে *ইকলজির* নন্দনতত্ত্ব কেবল জীবনানন্দেই দ্রষ্টব্য।

৩. জীবনানন্দের নায়কদের সম্পর্কে আকিমুন রহমান বলেছেন :

তিনি (জীবনানন্দ)আধুনিক ও অপ্রথাগত, কিন্তু অপ্রধান ঔপন্যাসিক। .... তাঁর উপন্যাস নায়ক-প্রধান। ওই নায়কদের বাস্তব জীবন ও হৃদয় পীড়িত হয় দুটি সংকট দ্বারা। ওই সংকট কোনো গভীর দার্শনিক সংকট নয়। ওই সংকটের একটি সম্পূর্ণরূপেই আর্থনীতিক, অন্যটি দাম্পত্য জীবনের অপ্রেমের সংকট। বিচিত্র স্বভাব ও প্রবণতার চরিত্র সৃষ্টি করতে ব্যর্থ জীবনানন্দ। .... বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি ওই একই সংকটের উপাখ্যান বলেন, শুধু পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে যায়।

দ্র. আকিমুন রহমান [১৯৯২ : ৬]।

৪. দ্বিতীয়পর্বের উপন্যাস বলতে জীবনানন্দের চল্লিশের দশকে লেখা উপন্যাসগুলো বুঝবো। এ-পর্বের দুটো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *জলপাইহাটি* (১৯৪৮) ও *বাসমতীর উপাখ্যান*। দেবেশ রায় লিখেছেন :

'দুটি উপন্যাসই বৃহৎ, তুলনায় 'বাসমতীর উপাখ্যান' বৃহত্তর—জীবনানন্দের বৃহত্তম উপন্যাস। .....

এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে লেখা তা ঠিক করে এখন বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এই দুটি উপন্যাস মিলে নিঃসন্দেহে এক পরিপূরকতা সৃষ্টি করে। .... ঔপন্যাসিক হিশেবে জীবনানন্দের এই দুটি উপন্যাসের একত্রে ব্যাপকতম বলা যায়।'

'সম্পাদকীয়', "বাসমতীর উপাখ্যান", [দেবেশ রায় ১৯৮৮ : ৪০১-৪০২]।

৫. Austen, 1972; Darcy-কে Elizabeth বলছে :

'One must speak a little, you know. It would look odd to be entirely silent for half an hour together.

৬. দ্র. জীবনানন্দ দাশ, *গিয়োকন্দা স্মাইল* : অল্ডাস হাক্সলি'। *চতুরঙ্গ*, শ্রাবণ ১৩৫৫।

৭. দ্র. জীবনানন্দ দাশ, *ডক্টর ফস্টাস* : টোমাস মান। *চতুরঙ্গ*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৬।

৮. দ্র. জীবনানন্দ দাশ, *জর্ণাল* : আঁদ্রে জিদ। *চতুরঙ্গ*, মাঘ, ১৩৫৫।

৯. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'শরৎচন্দ্র' নামক এই প্রবন্ধটি জীবনানন্দ ১৯৩৭ সালে বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আকিমুন রহমান
১৯৯২
'জীবনানন্দ দাশের নায়কেরা', *মাটি* (গোলাম কিবরিয়া সম্), বর্ষশুরু সংখ্যা। ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্)
১৯৮৩
সমালোচনা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ। ঢাকা : রূপম প্রকাশনী।

জগদীন্দ্র মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তী (সম্)
১৩৬১
ময়ূখ, জীবনানন্দ সমৃতি সংখ্যা। কলকাতা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮৬
জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। কলকাতা : ভারতী বুক এজেন্সি।

দেবেশ রায় (সম্)
১৯৮৫ *জীবনানন্দ সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেসন্স।
১৯৮৬ তৃতীয় খণ্ড।
১৯৮৭ চতুর্থ খণ্ড।
১৯৮৮ পঞ্চম খণ্ড।

ADORNO, Theodor
1974
Minima Moralia : Reflections From Damaged Life. London : Verso.

AUSTEN, Jane
1972
Pride and Prejudice. Harmondsworth : Penguin.

BAKHTIN, Mikhail
1981
The Dialogic Imagination (Trans : Caryl Emerson & Michael Holoquist). Austin : University of Texas Press.

BARTHES, Roland
1977
'The Death of the Author', in *Image-Music-Text* (Trans : Stephen Heath). London : Fontana.

COETZEE, J. H.
1988
White Writing : On the Culture of Letters in South Asrica. New Haven : Yale University Press.

DAVIS, Lennard J.
1989
Resisting Novels : Ideology and Fiction. New York & London : Methues.

FOUCAULT, Michel
1977
'What is an Author?' in *Language Counter-Memory. Practice : Selected Essays and Interviews* (Ed. Donald F. Bouchand & Sherry Simon). Ithaca : Cornell University Press.

SEELY, Clinton B
A Poet Apart—A Literary Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das. Delaware : University of Delaware Press.